আরবী শিশু সাহিত্য
অবলম্বনে রচিত

আলোর ফোয়ারা

৭

মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন

জীবন গড়ার গল্প

আলোর ফোয়ারা

আরবী শিশুসাহিত্য অবলম্বনে রচিত

অনুবাদ ও সংকলন

মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হুসাইন

ইমাম ও খতীব : বাইতুল কুদ্দুস জামে মসজিদ
বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোর ফোয়ারা

অনুবাদ ও সংকলন ঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হুসাইন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

তৃতীয় মুদ্রণ ঃ এপ্রিল ২০০৭ ঈসায়ী
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর ২০০৪ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৩ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ নাজমুল হায়দার
কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা

মুদ্রণ ঃ **মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স**
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-70048-0008-0

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ALOR FO ARA
Muhammad Sakhawat Hossain
Price Tk. 50.00 US $ 3.00 only

অর্পণ

আদুরের ভাগ্নি মুকাবিরা, স্নেহের ভাগিনা আব্দুল্লাহ,
উবাইদুল্লাহ্, এনায়াতুল্লাহ ও তোমাদের মত
কিশোর-কিশোরীদের হাতে।
সুন্দর জীবনের কামনায়-

-তোমাদের মামা

দুটি কথা

বিংশ শতাব্দীর মুসলিম বিশ্বের মহান পুরুষ আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) বলেছেন ঃ

একটি শিশু পৃথিবীর বাগানে ফুল হবে কিংবা কাঁটা হবে।

তোমরা যদি শিশুটির যত্ন নাও, ইসলামী শিক্ষা দাও, নবীজীর আদর্শে গড়ে তোল, তাহলে সে ফুলের মত পবিত্র এবং গোলাপের মত সুন্দর হবে।

পৃথিবীর এই মানব-বাগানে ফুলের মত সুবাস ছড়াবে। মানব-বাগানে চির সুন্দর হবে।

আর যদি শিশুটিকে অবহেলা কর এবং তার জীবনে ইসলামী শিক্ষার পরিবর্তে ধর্মহীন শিক্ষার বিষ ঢেলে দাও, তাহলে পৃথিবীর এই মানব-বাগানে ফুল না হয়ে সে হবে কাঁটা।

কাঁটা যেমন বাগানের সৌন্দর্য নষ্ট করে, এ শিশুটিও বড় হয়ে মানব-বাগানের সৌন্দর্য নষ্ট করবে। কাঁটা যেমন মানুষের শরীরে বিঁধে রক্ত ঝরায়, কষ্ট দেয়; এ শিশুটিও মানব-বাগানের কাঁটা হয়ে একদিন রক্ত ঝরাবে, বিষ ছড়াবে।

আমাদের শিশুরা যেন কাঁটা না হয়ে গোলাপ হয় এই বাসনায় এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

এই বই প্রকাশের শুভ মুহূর্তে আমার এক মহানুভব উস্তাদের কথা না লিখে পারছি না যার ভালোবাসা নি:স্বার্থ। যার কাছে বসলে মনে হয় শান্তি-সোহাগের সজীব পত্র-পল্লবে সজ্জিত একটি প্রকান্ড বৃক্ষের নীচে বসেছি। তিনি হলেন উস্তাযুল হাদীস মাওলানা আবুল বাশার সাহেব। সেই সাথে সশ্রদ্ধ স্মরণ করছি অগ্রজপ্রতিম খন্দকার মনসূর আহমদের কথা। যিনি তার অমূল্য সময় ব্যয় করে এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত দেখে দেয়ার দরুন এর সৌকর্য-সুষমা শতগুণে বর্ধিত হয়েছে।

এখানে এসে যার কৃতজ্ঞতা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। তিনি হলেন মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্তাধিকারী মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান খান। যার সাথে কথা বললে মনে হয় যে, সত্যাশ্রয়ী একজন বীর পুরুষ। যিনি প্রকাশনার মত কঠিন কাজটি সম্পাদন করলেন।

আল্লাহপাক সকলকে উত্তম বিনিময় দিন।

বিনীত

২০-০৬-২০০২ইং

মুহাম্মদ সাখাওয়াত হুসাইন
কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ

কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

মানবতার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)
মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রাহমানী
মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা মাত্র

তাযকিরাতুল আখেরাহ্
প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান
মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা মাত্র

বিজ্ঞানের আলোকে **কুরআনের অলৌকিকতা**
ইঞ্জিনিয়ার শেখ মুহাম্মাদ আব্দুল হাই
মূল্য ঃ ২২০.০০ টাকা মাত্র

ইসলাম ও আধুনিকতা
মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা মাত্র

আখেরাতের পাথেয় (মাওয়ায়েযে আবরার-১)
মুহিউস্ সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব
মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা মাত্র

কুরআনের আলোকে **দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি**
মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তাইয়্যেব (রহঃ)
মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা মাত্র

হৃদয়ের আলো
শাইখ বদিউয যামান সাঈদ নূরসী (রহঃ)
মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা মাত্র

আল্লাহ্ ওয়ালা
মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ)
মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা মাত্র

সূচীপত্র
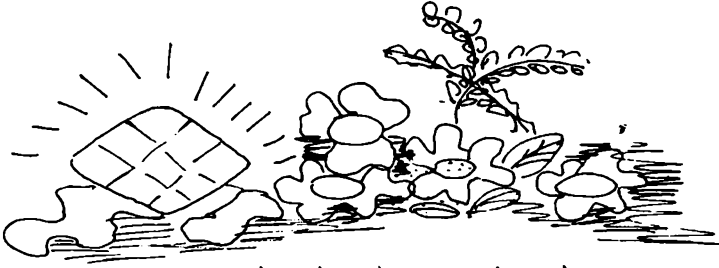
ভালো কাজের পুরস্কার

এক বৃদ্ধ পিতা। বয়স তাঁর আশির কোটা পেরিয়ে গেছে। চুল দাড়ি পেকে একেবারে কাশফুলের মত সাদা হয়ে গেছে। এখন তিনি মৃত্যুর পথযাত্রী। আখিরাত মুখী। দুনিয়ার সকল কামনা-বাসনা, মোহ-মায়া নিঃশেষ হয়ে গেছে তাঁর।

একদিন তিনি সন্তানদের ডাকলেন। মাত্র তিন ছেলে তাঁর। শ্রদ্ধেয় পিতার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে একে একে ছেলেরা সবাই হাজির হলো। যথাযথ আদব ও সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সবাই বসলো তাঁর সামনে। তারা অবাক হয়ে দেখতে লাগলো তাদের বাবার হাতে একটি হীরক খণ্ড চিক চিক করছে। সবার মন খুশিতে নেচে উঠলো। বিপুল কৌতূহল আর উচ্ছাসে চক চক করছে চেহারাগুলো। নিশ্চয়ই তিনি তাদের এটা দিবেন। সবাই হাজির হলে পিতা সকলকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

তোমরা সবাই আমার হাতে একটি মূল্যবান হীরকখণ্ড দেখতে পাচ্ছো। এটা পাওয়ার আশা তোমরা সবাই কর তাই না? কিন্তু না, তোমরা সবাই এটা পাবে না। তোমাদের মধ্যে সে-ই এটা পাবে যে একটি ভালো কাজ করবে।

বাবার কথা শেষ হলে প্রথম ছেলে এগিয়ে এলো। সে বললো-

বাবা! আমার নিকট একজন অপরিচিত লোক এসে তার ধন-সম্পদ আমানত রাখতে বললো। যাকে আমি কোন দিন দেখিনি। ইতোপূর্বে কখনো আমার সঙ্গে সাক্ষাতও হয়নি। তখন আমি মনে মনে পণ করলাম এ লোকটির সঙ্গে আমি কোন প্রকার প্রতারণা করবো না। তাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করবো না। যখনই সে তার গচ্ছিত সম্পদ নিতে আসবে, তখনই তার সম্পদ তাকে বুঝিয়ে দিবো। বাস্তবে করলামও তাই। সে তার সম্পদ ফেরত নিতে এলে, তার সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দিলাম।

ছেলের কথা শেষ।

এবার পিতার বক্তব্য—

হে আমার আদরের সন্তান। এটা আমানত। আর আমানত রক্ষা করা জরুরী। সুতরাং এর কোন বিনিময় হতে পারে না। পিতার বক্তব্য শুনে সে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলো।

এবার এগিয়ে এলো দ্বিতীয় ছেলে। সে বললো—

আমি ছোট্ট একটি বালককে দেখলাম, যে সাঁতার কাটতে জানে না। সে পানিতে ডুবে যাচ্ছে। তখন আমি ছুটে গিয়ে ডুবে যাওয়ার পূর্বেই আসন্ন মৃত্যুর ভয়াল থাবা হতে তাকে বাঁচালাম।

ছেলের কথা শেষ হল।

এবার বাবা বললেন—

ওহে আমার প্রাণপ্রতিম বৎস! এটা হলো মানবতা। আর মানবতা প্রত্যেক মানুষের জন্য আবশ্যক। অতএব এর কোন প্রতিদান হতে পারে না। পিতার বক্তব্যে সেও হতাশ হয়ে ফিরে গেলো।

সবার শেষে এগিয়ে এলো তৃতীয় ছেলে। সে বললো—

আমার শত্রু। যে সর্বদা আমাকে কষ্ট দিতো। এমনকি সুযোগ পেলে আমাকে হত্যা করতেও দ্বিধা করতো না। তাকে আমি দেখলাম, সে ঘুমিয়ে আছে নদীর তীরে। হয়তো অল্প সময় পরে সে

নদীর অথৈ পানিতে হারিয়ে যাবে চির দিনের তরে! তখন আমি তার শত্রুতার কথা ভুলে দৌড়ে গিয়ে তাকে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করলাম।

ছোট ছেলের কথায় বাবা খুব আনন্দিত হলেন! দারুণ মুগ্ধ হলেন! আদর সোহাগে তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বললেন –

হে আমার কলিজার টুকরো স্নেহের দুলাল! তুমিই পেতে পার এ অমূল্য হীরকখণ্ড। মহাপুরস্কার। তোমার কাজই উত্তম। প্রশংসার দাবীদার। এরূপ ভালো কাজ একমাত্র উন্নত চরিত্র ও মহৎ দিলের অধিকারী লোকেরাই করে থাকেন।

মহৎ কে?

মা'আন ইবনে যায়েদ। বংশে আরব। থাকতো আব্বাসী খেলাফতের দ্বিতীয় খলীফা আবু মনসূর আব্বাসীর দরবারে। একবার সে মারাত্মক অপরাধ করে বসে। কৃত অপরাধের শাস্তি নিশ্চিত মৃত্যুদন্ড জেনে দরবার ছেড়ে পালিয়ে যায়। মুক্তির জন্য গ্রহণ করে এক অভিনব পদ্ধতি। মাথা মুন্ডিয়ে ফেলে। দাড়ি ছোট করে ফেলে। গায়ে পরে পশমের মোটা জুব্বা। ধারণ করে অচেনা পথিকের বেশ। এরপর সে উটে চড়ে গ্রামের দিকে রওয়ানা করে।

এদিকে শহরময় ছড়িয়ে পড়ে খলীফার ঘোষণা। যে মা'আন ইবনে যায়েদকে ধরে এনে দরবারে হাজির করতে পারবে, তাকে মূল্যবান পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। খলীফার ঘোষণা শুনে পুরস্কারের আশায় সৈন্য-সামন্তরা দিক বিদিক ছড়িয়ে পড়ে। জনৈক সৈনিক খুঁজতে খুঁজতে ছুটে যায় গ্রামের পথ ধরে। চলতে চলতে এক স্থানে যেয়ে মা'আনের দেখা পেয়ে যায়। তখন সৈনিক প্রশ্ন করলো তুমিই কী সেই পলাতক আসামী, যাকে আমীরুল মুমিনীন খুঁজছেন?

সৈনিক মা'আনের উটের লাগাম ধরে আছে, তবু তার কোন ভয় নেই, চেহারায় কোন শংকার চিহ্ন নেই। নাহ! তার বুকে দুরু, দুরু ভাবও নেই। সে নিজেকে গোপন রাখার জন্যে নির্ভয়ে জবাব দিলো,

আমি আবার কে? যে কারণে স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন আমাকে খোঁজ করবেন।

অতঃপর মা'আন পকেট থেকে একটি মূল্যবান মুক্তা বের করে সৈনিকের হাতে দিয়ে বললো, বাদশাহ যে পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন এর দাম তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। এটা নিয়ে তুমি আমার পথ ছেড়ে দাও।

সৈনিক মুক্তাটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললো, হ্যাঁ তুমি সত্যিই বলছো। এটি আসলেই একটি অতি মূল্যবান মুক্তা। এখন আমি তোমাকে ছাড়তে পারি, তবে শর্ত আছে। আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করবো যদি সত্য কথা বলো, তবে ছেড়ে দিবো।

সৈনিক প্রশ্ন করলো ঃ লোকমুখে তোমার দানের খুব প্রশংসা শুনি এখন তুমি আমাকে বল, তুমি কী কখনো তোমার আয়ের অর্ধেক দান করেছো?

মা'আন ঃ না, তা করিনি।

সৈনিক ঃ তবে কী তোমার আয়ের এক তৃতীয়াংশ দান করেছো?

মা'আন ঃ না, তাও করিনি।

এভাবে বলতে বলতে সৈনিক এক পর্যায়ে বললো তবে কী আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ দান করেছো? এবার মা'আন লজ্জা বিবর্ণ চেহারায় জবাব দিলো, হ্যাঁ, তা হয়তো করেছি।

তখন সৈনিক বললো, আল্লাহর কসম! আমি এক সাধারণ সৈনিক। মাসিক আমার আয় মাত্র বিশ দেরহাম। আর তোমার এ মুক্তার দাম বিশ দিনার। এটা আমি তোমাকে এবং তোমার মাধ্যমে তোমার পরিবারকে দান করলাম। যাতে তুমি জানতে পার পৃথিবীতে তোমার চেয়ে বড় দানশীল ও মহৎ কে ?

আর মনে রেখো! কল্যাণের কাজে কখনো পিছিয়ে থেকো না। এই বলে সৈনিক চলে গেলো।

পিপাসার্ত হরিণ

গ্রীষ্মের ভর দুপুর। সূর্যের প্রচন্ড উত্তাপে মাথার চাঁদি ফেটে যাওয়ার মত অবস্থা। গাছের ডাল-পালা, লতা-পাতা পর্যন্ত নড়ে না। তৃষ্ণা পিপাসায় কাত হয়ে পড়েছে পশু-পাখী, মানুষ সকলে।

ঠিক তখন একটি হরিণ পিপাসার্ত হয়ে অস্থিরভাবে ছুটাছুটি করতে থাকে। হঠাৎ একটি কূপ পেয়ে যায়। পানি দেখে পিপাসা মিটানোর জন্য ধীরে ধীরে কূপের ভিতর নেমে যায়। তৃপ্তি ভরে পান করে নেয় কূপের স্বচ্ছ পানি। এরপর উঠে আসার চেষ্টা করে কূপ থেকে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও বার বার ব্যর্থ হয় হরিণটি।

এমন সময় উক্ত কূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো একটি শিয়াল। সে হরিণকে কূপের ভিতর দেখে বললো, এখানে থেকেই তুমি মৃত্যু বরণ করো। আর শুনে রাখ! তোমার এ দুরদশার জন্যে দুঃখিত হয়ো না, বরং নিজেকে তিরস্কার করো।

শিয়াল চলে গেলো। হরিণটি কূপের ভিতর ঐভাবেই ছটফট করছে। এরই মধ্যে সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলো এক পথিক। তিনি দেখলেন, হরিণটি খুব ছটফট করছে, উঠার জন্যে বারংবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে। এ অবস্থা দেখে তাঁর দয়া হলো। তিনি কূপের ভিতর নামলেন এবং হরিণটিকে কাঁধে উঠিয়ে উপরে তুলে আনলেন।

চরম বিপদের মুহূর্তে সাহায্যের জন্যে হরিণটি ঐ পথিকের শুকরিয়া আদায় করলো।

সে সময় পথিক হরিণকে বললো, খুব ভালো করে মনে রেখো!

"নীচু চরিত্রের লোকের কাছে কভু সাহায্যের আশা করো না, আর কর্মের পরিণতি না ভেবে কোন কাজ করো না।"

কৌশল

গভীর অরণ্য। তার মাঝ দিয়ে মস্ত বড় অজগরের মত এঁকে বেঁকে বহু দূরে চলে গেছে এক দীর্ঘ পথ। পথের দু ধারে শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ঘন ডালপালা বিশিষ্ট বড় বড় গাছ-গাছালি। মাঝে মাঝে রয়েছে নানা লতা-পাতায় ঘেরা ঝোপঝাড়।

সে পথ ধরেই কোথাও যাচ্ছে এক পথিক। কিন্তু এই নির্জন জঙ্গলে একাকী পথ চলতে ভয়ে তার বুক দুরু দুরু কাঁপছে। না জানি কখন কোন হিংস্র প্রাণী এসে আমার উপর হামলা করে বসে। এ ধরণের হাজারো চিন্তা করছে আর সামনের দিকে হাঁটছে। এমন সময় সামনে হঠাৎ দেখলো তার দিকে ধেয়ে আসছে এক সিংহ।

তখন সে মনে মনে ভাবলো এখন আমার উপায় কী? এখানে যদি দাঁড়িয়ে থাকি তবে আমাকে খেয়ে ফেলবে। আর যদি দৌড়াই, তাহলেও তার সঙ্গে পেরে উঠবো না। কিন্তু সে নিরাশ হয়ে বসে রইলো না। কারণ তার জানা আছে "চেষ্টা করলে উপায় হয়।" নিকটেই দেখলো বড় একটি গাছ। দেরি না করে গাছ বেয়ে দ্রুত উপরে উঠে গেলো। সিংহটি গাছের নীচে এসে তর্জন-গর্জন করতে করতে ঘুরতে লাগলো। এখন সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। কেননা সিংহ কোন দিন গাছে উঠতে পারবে না।

লোকটি সিংহের থাবা থেকে বাঁচলো বটে, তবে এ দিকে আবার তার ভিতরে ঢুকলো আরেক ভয়। তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা। একটু পরেই পৃথিবীতে নেমে আসবে রাতের কালো অন্ধকার। দু'চোখে নেমে আসবে তন্দ্রা। তখন তো গাছ থেকে নীচে পড়ে মৃত্যুর ভয় আছে। কাজেই অন্ধকার আসার আগেই আমার মুক্তির পূর্ণ ব্যবস্থা করতে হবে। এই চিন্তা করে উপরের দিকে তাকাতেই দেখলো গাছের মগডালে বসে আছে কালো কম্বলের মত এক ভল্লুক। এবার সে আরো বিচলিত হয়ে পড়লো। বিপদের পর বিপদ। একটা থেকে মুক্তি পেলে নতুন আরেকটা। কিন্তু না, বিপদে সাহস হারালে চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় খেলে গেলো নতুন বুদ্ধি। পকেট থেকে ছুরি বের করে ভল্লুক বসা ডালটি কাটতে লাগলো। ডাল কেটে দিতেই ধপাস করে ভল্লুকটি পড়লো একবারে সিংহের সামনে।

এবার শুরু হলো সিংহ আর ভল্লুকের মাঝে তুমুল লড়াই। লড়াই করতে করতে রক্তাক্ত অবস্থায় পালিয়ে গেলো ভল্লুকটি। আর সিংহটি ক্লান্ত হয়ে সেখানেই লুটিয়ে পড়লো। এই সুযোগে লোকটি গাছ থেকে নেমে দ্রুত নিরাপদ স্থানে পালালো। কৃতজ্ঞ মুখে বলল, সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি তোর অনিষ্ট থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।
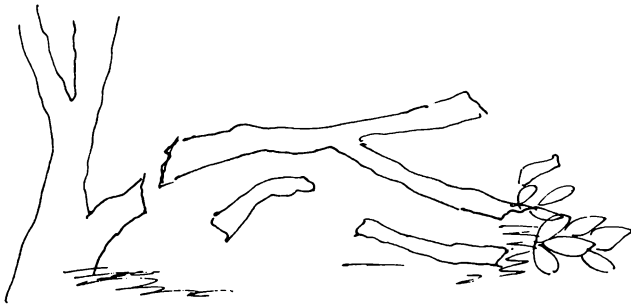
পরীক্ষা

বিশাল এক চারণ ভূমি। মদীনার অদূরে সবুজ কচি ঘাসে ভরা এই বিস্তৃত চারণ ভূমিতে হাজারো পশু চরে বেড়ায়। মরু সাহারার রাখাল বালকেরা দল বেঁধে এখানে পশু চরাতে আসে। বালক নাঈমও আসে। মদীনার প্রসিদ্ধ এক ধনীর বকরী চরানোই তার কাজ। সেই সাত সকালে বকরীগুলো নিয়ে বেরিয়ে যায় আবার সন্ধ্যা বেলা বকরীগুলো তাড়াতে তাড়াতে ফিরে আসে। সারা দিন প্রচন্ড রোদে পুড়ে পুড়ে বকরী চরায়। মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আর গাছগাছালির ছায়ায় একটু আধটু বিশ্রাম করে নেয়। এভাবেই কাটে নাঈমের সকাল-সন্ধ্যা, দিন-রাত।

সেদিনও বালক নাঈম বকরী চরাতে এসেছিলো। তখন ঠিক দুপুর। এমন সময় তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো একজন লোকের উপর। ঠিক যেন তার দিকেই এগিয়ে আসছে। তিনি জনদরদী এক বর্ষীয়ান জ্ঞান তাপস। পাণ্ডিত্যের আভা তার গোটা চেহারা জুড়ে। দেখতে ভারী সুন্দর! স্নেহ-মমতার প্রতিচ্ছবি যেন। সবার শ্রদ্ধার পাত্র তিনি।

নাঈমের কাছে এসেই থেমে গেলো তাঁর চলার গতি। তিনি নাঈমের আমানতদারী পরীক্ষা করতে চাইলেন। ওকে মিষ্টি স্বরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

বাছা! আমাকে একটি বকরী দিবে? জ্ঞান তাপসের কথায় নাঈম ভীষণ অবাক হলো! একেবারে চমকে উঠলো।! তারপর ভেবে চিন্তে শ্রদ্ধা ভরা বিনয় ঝরা কণ্ঠে বললো, জনাব! বকরী চরানোই আমার মূল কাজ। আমি কি পারি বকরী দিতে? তাছাড়া এগুলো হচ্ছে আমার কাছে এক রকম আমানত। এগুলোর প্রকৃত মালিকও আমি নই। আমার হলে আপনাকে একটি বকরী দিতে আমি একটুও কার্পণ্য করতাম না।

জ্ঞান তাপস রাখাল নাঈমকে আরেকটু পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি ওকে বললেন ঃ

তোমার মনীবকে বলবে, সে বকরীটি পাল থেকে বেরিয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলো, তখন সেটাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। এভাবে বললে তিনি তোমার কথা অবশ্যই বিশ্বাস করবেন। কারণ তিনি তো আর সারাক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকেন না বা তোমার প্রতি নজরও রাখেন না, তিনি কি করে তোমার গোপন কথা সম্পর্কে জানবেন?

জ্ঞান তাপসের কথা শেষ হতেই নাঈমের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো প্রত্যয় ভরা বুদ্ধিদীপ্ত চমৎকার জবাব। জনাব! যদিও মনীব আমাকে দেখছেন না এবং সর্বদা আমার উপর কড়া নজর রাখছেন না। কিন্তু, মহান আল্লাহ যিনি সব কিছু জানেন এবং সব কিছুর উপর সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখেন, তাঁর হাত থেকে কে আমায় রক্ষা করবে?

অত্যন্ত সরল, দারুণ সাদাসিধে, অথচ প্রবল বিশ্বস্ততায় ভরা ওর উত্তর শুনে জ্ঞান তাপস দারুণ অভিভূত হলেন! পরম আনন্দে জুড়িয়ে গেলো তাঁর হৃদয় - মন। মনে মনে আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। এতটুকুন ছেলে, অথচ কত বিশ্বস্ততায় ভরা ওর কথা!!

জ্ঞান তাপস নাঈমের কাছ থেকে মনীব সম্পর্কে বিস্তারিত জানলেন। তাঁর ঠিকানা নিলেন। তারপর সোজা মনীবের বাড়ীতে

গিয়ে তাকে বললেন ঃ তোমার বকরীগুলো আমার কাছে বিক্রি করে দাও।

মনীব ছিলেন খুব চালাক ও বুদ্ধিমান। তিনি বুঝলেন নিশ্চয়ই এর মাঝে কোন রহস্য লুকায়িত আছে। তাই কথা না বাড়িয়ে বললেন ঃ মহামান্য সাধক! এগুলো আপনাকে আমি বিনামূল্যে দান করলাম। কেননা আপনার কাছে যা থাকবে, তাই সাধারণ লোকদের উপকারে আসবে।

পরের দিন পূর্বাকাশে রক্তিম সূর্য উদিত হলো। চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো ঝকঝকে সুন্দর আলো। প্রতি দিনের মত আজও নাঈম বকরী চরাতে এসেছে। জ্ঞান তাপসও এসেছেন ওর সন্ধানে। অনায়াসেই পেয়ে গেলেন কাংখিত বালককে। এরপর জ্ঞান তাপস ওকে কাছে ডেকে স্নেহ ভরা কোমল কণ্ঠে বললেন ঃ

তুমি কতই না উত্তম বালক! তোমার উপর অর্পিত আমানতের যথাযথ হিফাযত করেছো। মনীবের নিকট কৃত তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছো। আজ থেকে তুমি চির দিনের জন্যে মুক্ত। আর এ বকরীগুলোও সব তোমার। আমানতদারী তোমাকে রাখালীর জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং তোমার আখেরাতের মুক্তির জন্যও আমি মহান মাওলার শাহী দরবারে দু'আ করবো।

আলোর পথে

এক মহান সাধক। লোকে বলে জ্ঞানের রাজা। জ্ঞানে গুণে তিনি ভুবনবিখ্যাত। আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী, ইলম চর্চা আর মানবতার কল্যাণ সাধনায় কাটে তাঁর দিন রাত। রাতের বেশীর ভাগ সময় কাটে তাঁর আল্লাহর যিকির, নামায ও কুরআন তিলাওয়াতে। এই মহান সাধকের প্রতিবেশী ছিলো এক যুবক। সে ছিলো চরম বখাটে। তার চাল-চলন, রীতি-নীতি ছিলো একেবারে বেয়াড়া ধরণের। শরাব পান করতো আর রাত্রিবেলা শহরের অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াতো। মাঝ রাতে বাড়ী ফিরে এসে মেতে উঠতো নানা রকম অশ্লীল গান বাজনায়।

এক রাতের ঘটনা। ঐ যুবকের কোন শব্দ শুনতে পেলেন না তিনি। তাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন, ভাবলেন নিশ্চয় সে বড় ধরণের বিপদের পড়েছে। ঐ যুবকের চিন্তায় রাতভর তাঁর ঘুম হয়নি। বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছেন শুধু।

পর দিন প্রভাত হতেই বেরিয়ে পড়লেন তার সন্ধানে। খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলেন, গত রাতে তাকে পুলিশ ধরে জেলখানায় নিয়ে গেছে।

সাধকের নাম যশ জগত জুড়ে। রাজা কী প্রজা, ধনী কী গরীব, জ্ঞানী কী মূর্খ সবাই তাঁকে সমানভাবে চিনে ও জানে। সবাই তাঁকে

সমীহ করে। শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তাঁর কথা মানে। কেউ তাঁর কথা উপেক্ষা করে না। অমান্য করে না।

তিনি নিজে জেলখানার প্রধান কর্মকর্তার কাছে গেলেন, তার মুক্তির জন্যে জোর সুপারিশ করে বললেন, আশা করি আজ থেকে সে সকল অন্যায় কাজ ছেড়ে দিয়ে সত্য-সুন্দর ও আলোর পথে ফিরে আসবে।

বিফলে গেলো না সম্মানিত সাধকের সুপারিশ। মুক্তি পেলো যুবক। সাধকের এই উদার মনোভাব ও তাঁর অমায়িক ব্যবহারে যুবক দারুণ মুগ্ধ হলো।! নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলো। সে তখন সাধকের কাছে গিয়ে কৃতজ্ঞতা ভরা কণ্ঠে বললো, প্রতিবেশীর সাথে এ সুন্দর আচরণের জন্যে আল্লাহ পাক আপনাকে উত্তম বিনিময় দিন। আর আমি আল্লাহর কাছে সততা ও নিষ্ঠার সাথে মনে প্রাণে তাওবা করছি এবং আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এখন থেকে আমি আর কোন দিন আল্লাহর সন্তুষ্টির বিপরীত কোন কাজে লিপ্ত হবো না।

সেদিন থেকে সে সকল অন্যায় অপরাধ ছেড়ে দিয়ে ভালো হয়ে গেলো। আঁধার থেকে আলোর পথে এগিয়ে এলো সে।

কে এই মহান সাধক?

ইনি আর কেউ নন। ইনি ফেকাহ শাস্ত্রের মহান ইমাম, জগত বিখ্যাত মনীষী, হানাফী মাযহাবের প্রবর্তক ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)। তাঁর সমগ্র জীবনই ছিলো সত্য ও ন্যায়ের এক সুন্দরতম আদর্শ।

শীতের রাত

প্রজা হিতৈষী, আদর্শ ও নিষ্ঠাবান এক শাসক, অর্ধ জাহানের বাদশাহ্ হয়েও যিনি অতি সাদাসিধে জীবন কাটিয়েছেন। তালিযুক্ত পোশাক পরেছেন। অন্যান্য রাজা বাদশাদের মতো ডুবে যাননি দুনিয়ার ভোগ বিলাস ও আরাম আয়েশের সাগরে। ভুলে যাননি নিরীহ জনগণের সুখ-দুঃখের কথা। গভীর রাতের নিশুতি প্রহরে ঘুরে বেড়িয়েছেন শহরের অলি-গলি ও গ্রাম অঞ্চল জুড়ে। জেনেছেন প্রজাদের অবস্থা। শুনেছেন তাদের অভিযোগ। দিয়েছেন সুষ্ঠু সুন্দর সমাধান। এর পরেও প্রভুর ভয়ে কান্নাভেজা কণ্ঠে বলেছেন ঃ ফোরাতের তীরে একটি কুকুরও যদি না খেয়ে মরে যায়, তবে আমাকে আল্লাহর কাছে জবাবদেহী করতে হবে।

এক রাতের ঘটনা। রাতটি ছিলো কনকনে শীতের। অন্যান্য রাতের মতো আজও তিনি প্রজা সাধারণের সুখ-দুঃখ ও ভালো-মন্দের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে বেরিয়েছেন। তাঁর সাথে আছে শুধু গোলাম আসলাম। নেই এ যুগের মতো বন্দুকধারী কোন দেহরক্ষী। দু'জনে পথ চলছেন আর বিমুগ্ধ নয়নে দেখছেন মদীনার তারকাখচিত খোলা আকাশের নীচে দালান-কোঠা, পূর্ণকুটির।

পথ চলতে চলতে দু'জন শহরের সীমানা পেরিয়ে এক সময় পৌঁছে গেলেন মদীনা হতে তিন মাইল দূরে 'সিরার' নামক স্থানে। সেখানে পৌঁছে হঠাৎ তিনি দেখলেন, একটু দূরে কুড়ে ঘরে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে।

মরুর বুকে নরম পায়ের ছাপ ফেলে উভয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন কুড়ে ঘরের দিকে। দেখলেন, বসে আছে এক বুড়িমা। তাঁর পাশে বসে কাঁদছে কয়েকজন শিশু। সামনে চুলার উপর একটি ডেগ।

তিনি আর এক কদম সামনে অগ্রসর হয়ে দরদ মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কী করছো বুড়ি মা ? ওদের কী হয়েছে ? ওরা কাঁদছে কেন ? আর এই ডেগের ভিতরে কী পাকাচ্ছো ? বৃদ্ধা অশ্রু ছলছল চোখে, কান্নাভেজা কণ্ঠে জবাব দিলেন, ওরা এখনো পর্যন্ত কিছু খায়নি তাই ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদছে। আর ডেগের ভিতর শুধু পানি। এর দ্বারা ওদের বুঝ দিচ্ছি যাতে ঘুমিয়ে পড়ে।

বৃদ্ধার জবাব শুনে মহানুভব খলীফার মন কেঁদে উঠলো। অনুশোচনায় দগ্ধ হলেন। আহ! তাঁর রাজ্যে এমন কষ্টে আছে একটি পরিবার, অথচ তিনি জানেন না।

তিনি আর দেরী করলেন না। রাতের অন্ধকার মাড়িয়ে গোলামকে নিয়ে ছুটে এলেন মদীনায়। এসে সোজা চলে গেলেন 'বাইতুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে' যেখান হতে গরীব-মিসকীনদের ভরণ-পোষনের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে ঢুকলেন। ঢুকে ময়দা, গোস্ত, ঘী ও খেজুর নিয়ে আবার 'সিরারে' ফিরে আসেন।

সিরারে পুনরায় ফিরে আসার পথে গোলাম বললো, বাদশাহ নামদার! এগুলো আমি বয়ে নিয়ে যাই। কিন্তু মহান খলীফা গোলামের কাছে সামান দিলেন না, বরং তাকে বললেন, আমার কাঁধে তুলে দাও। এটা আমার দায়িত্ব। কিয়ামতের দিন আমার দায়িত্বের ভার অন্য কেউ নিবে না এবং আমার কাজেও আসবে না।

অতঃপর দু'জনেই আবার ঐ বাড়ীতে পৌছলেন। বাড়ীতে পৌছে খলীফা নিজ হাতে শিশুদের জন্য রুটি বানালেন। নিজে চুলায় আগুন জ্বালালেন। এভাবে খলীফা ও বৃদ্ধা দু'জনে মিলে শিশুদের খাবারের ব্যবস্থা করলেন। নিজ হাতে শিশুদের খাওয়ালেন। তৃপ্তি ভরে খেয়ে শিশুরা হরিণ ছানার মতো আনন্দে নেচে উঠলো। তাদের সবার চোখে-মুখে ঝিলিক দিয়ে উঠলো হাসির রেখা। তারা সেই মহানুভব খলীফার শুকরিয়া আদায় করলো। বৃদ্ধা বললেন ঃ

আল্লাহ্পাক তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। সেবার জন্য খলীফার চেয়ে তুমিই অনেক ভালো। আসলে বুড়িমা চিনতে পারেননি ইনিই ইতিহাসের চির স্মরণীয় ব্যক্তি, সত্য-ন্যায়ের প্রতীক, অন্যায়, অসত্যের ত্রাস, খলীফা হযরত উমর (রাযিঃ)

বালকের বুদ্ধি

অনেক দিন আগের কথা। এক বাদশাহ্ বেরিয়েছেন শিকারে। সাথে তাঁর চাকর-নওকর আর সৈন্য-সামন্তের বিশাল কাফেলা। নির্জন বন-বনানী মাড়িয়ে এগিয়ে চলছেন তাঁরা শিকারের সন্ধানে। সহসা বাদশার চোখ পড়লো দূরের একটি হরিণের প্রতি। হরিণটি দৌঁড়াচ্ছে। শিকারটি দেখামাত্র খুশিতে ভরে উঠলো তাঁর মন। তিনি বললেন ঃ

আল্লাহর শপথ! একে আমি শিকার করবোই, এর গোশ্‌তই হবে আমাদের দুপুরের খাবার, বলেই তিনি বিসমিল্লাহ পড়ে তীর ছুঁড়লেন। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না সেই তীর। তীর একেবারে হরিণটির কণ্ঠনালীতে বিদ্ধ হলো। সঙ্গে সঙ্গে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়ে হরিণটি ছটফট করতে লাগলো।

বাদশাহ্ দেখলেন, একটি বালক বকরী চরাচ্ছে। তার সাথে আছে তার ছোট্ট ভায়েরা। তিনি হাতের ইশারায় বালককে ডাকলেন। বালকটি কাছে এলে তিনি বললেন, যাও দৌড়ে গিয়ে ঐ হরিণটি নিয়ে এস। তোমার ভায়েরা এখানে অপেক্ষা করুক।

কিন্তু কী অবাক কাণ্ড! ছেলেটির কোন ভয় নেই। কোন ডর নেই। সূর্যের তপ্ত কিরণে ঘাসের উপর ছড়িয়ে থাকা শিশির বিন্দুরা

শুকিয়ে গেলে ঘাসের শক্ত হওয়ার মতোই ওর কচি ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলো দৃঢ়চিত্ত নির্ভীক জবাব। না, আমি কক্ষনো ভাইদের ও বকরীগুলোকে রেখে ওখানে যেতে পারবো না।

বালকের জবাবে বাদশার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। তাঁর গৌরব, অহংকার, আত্মসম্মান, দাপট সবই যেন ধূলোয় লুটোপুটি খেলো। চোখে-মুখে ফুটে উঠলো ক্রোধের ছাপ। সুন্দর চেহারা জবা ফুলের মতো রক্ত লাল হয়ে গেলো। কিন্তু তিনি মুখ খুলছেন না। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে পুঁচকে এক বালকের দুঃসাহস দেখানোর দৃশ্য তাঁকে ভীষণ ভাবিয়ে তুললো।! হতবাক বিস্ময়ে তিনি পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছেন। হারিয়ে যাচ্ছেন চিন্তার দিগন্তহীন সাগরে।

এদিকে তাঁর লোক-লশকররা তো রাগে রোষে অগ্নিশর্মা।! তাঁদের উপস্থিতিতে বাদশাহর এমন অবমাননা?! এযে সহ্য সীমার বাইরে।

শুধু কী তাই? এখানে তো বাদশাহ মহোদয়ের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন! তাই তাঁরা বাদশার হুকুমের অপেক্ষা না করে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো বালকের হাত-পা।

কিন্তু এযে আরো অদ্ভুদ ব্যাপার! ওকে বেঁধে ফেলা হয়েছে, অথচ চোখে-মুখে কোথাও ভয়ের কোন আলামত দেখা যাচ্ছে না। সে দিব্যি খিলখিল করে হাসছে।

বাদশাহ তখন বালককে প্রশ্ন করলেন, তুমি হাসছো কেন? আমার লোকেরা তো এখন তোমাকে পিটাবে। বালক উত্তরে বললো,

একদিন এক বাজপাখি একটি ক্ষুদে চড়ুইকে ধরে খেতে চাইলো, চড়ুই তখন বাজপাখিকে বললো, জনাব! আমি একেবারে পিচ্চি। আমার গোশ্‌ত খেয়ে আপনার পেট ভরবে না। তাছাড়া আমার

ভায়েরা শীঘ্রই আল্লাহর কাছে আপনার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করবে। চড়ুইয়ের কথায় বাজপাখি হাসতেই মুখ খুলে যায়। সাথে সাথে চড়ুইটি উড়ে যায়।

বালকের কথা শুনে বাদশাহ নিজেও হেসে ফেললেন। খুশি হয়ে ওর অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। এখানেই কী শেষ? পুরস্কার স্বরূপ ওকে দিলেন স্বর্ণ মুদ্রার একটি থলে।
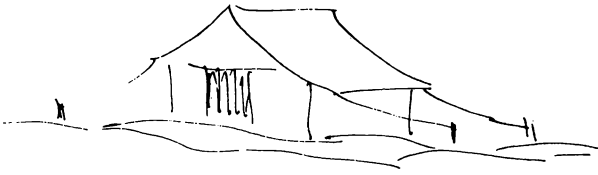
শিক্ষা সফর

বসন্ত হলো ঋতুর রাজা। সত্যি রাজাই বটে। রাজার মতোই তার সাজ-সজ্জা। শীতের বিবর্ণ হাওয়ায় গাছপালা যখন শ্রীহীন, প্রকৃতি যখন মৃতপ্রায়, ঠিক তখনই ঋতুরাজ বসন্ত তার রাজকীয় সৌন্দর্য নিয়ে আবির্ভূত হয় মহা সমারোহে, বসন্তের আগমনে সাজ সাজ রব পড়ে যায় চারদিকে। এ ঋতুর জাদুকরী ছোঁয়ায় প্রকৃতি ফিরে পায় নতুন জীবন। বৃক্ষরাজি আবার ঘন সবুজ পত্র-পল্লবে সুসজ্জিত হয়। এক অপূর্ব রূপ ধারণ করে প্রকৃতি। দক্ষিণা বাতাস বয়ে যায় চারদিকে। সেই সাথে বসন্ত দূত কোকিলের মন মাতানো কুহু কুহু ধ্বনি বনে বনে, ফুলে ফুলে মৌমাছিদের গুন গুনানী, আর প্রজাপতির রঙ্গীন ডানা মেলে উড়ে বেড়ানোর দৃশ্য পৃথিবীকে যেন আরও মোহময় করে তোলে, তার সৌন্দর্যকে যেন আরও বাড়িয়ে তোলে। তখন যেন পৃথিবী তার সেই মনভুলানো চোখজুড়ানো অপরূপ সৌন্দর্য দেখার জন্য নিমন্ত্রণ জানায় সবাইকে। সৌন্দর্য পাগল মানুষও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ছুটে যায় সবুজের গালিচা বিছানো গ্রামের বাড়ীতে। প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য উপভোগের জন্যে। তারা দেখে আল্লাহর অসীম কুদরত ও মহিমা।

তখন ছিলো বসন্ত কাল। শিক্ষা সফরে রেরিয়েছেন জনাব আবু সালেহ। তাঁর সাথে রয়েছে আপন ভাই হিশাম, শ্বশুর আব্দুল্লাহ, ছেলে সা'আদ, ফাহাদ, হামীদ ও মেয়ে হিন্দা, শাহিদা, খালেদা এবং স্ত্রী সালেহা। এক স্থানে পৌঁছে জনাব আবু সালেহ সকলকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পূর্ব পরিচিত অন্তরঙ্গ বন্ধু জনাব মুহাম্মদের বাড়ীতে বিশ্রাম নেন।

বিশ্রাম শেষে সেখান থেকে ভাই, শ্বশুর এবং এক ছেলেকে নিয়ে শাক-সবজি দেখার জন্য রওয়ানা হন। পথিমধ্যে জনাব আবু সালেহ শ্বশুরকে তুলা রোপনের পদ্ধতি ও ভাইকে আখ লাগানোর পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তাঁরা উভয়ে নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তখন তিনি সুন্দরভাবে তাদেরকে এগুলোর নিয়ম কানুন বুঝিয়ে দেন। পাশাপাশি তিনি ক্ষেত-খামার, শষ্য এবং শাক-সবজির উপকারিতার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ বিষয়ে নবীজী (সাঃ) এর হাদীস শোনান। প্রিয় নবীজী (সাঃ) বলেছেন ঃ

"কেউ যদি কোন কিছু (গাছ বা চারা) লাগায় অথবা রোপণ করে, অতঃপর তা হতে পশু-পাখি, চতুষ্পদ প্রাণী কিংবা মানুষ খায়, তবে সে সদকার সওয়াব পাবে।"

এরই মধ্যে সময় গড়িয়ে গেলো। মাথার উপর এখন দুপুরের তেজোদীপ্ত সূর্য। ঠিক দুপুর। সুনীল আকাশ জুড়ে সোনালী রোদের ঝিকিমিকি। তখন ছোট মেয়ে খালেদা তাঁদের ডাকতে এলো। ওর ডাকে তাঁরা বাড়ী ফিরে এলো। সাবান দিয়ে ভালভাবে হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সবে খেতে বসেছে, এমন সময় বাড়ীর পালা কুকুরটি ঘেউ ঘেউ চিৎকারে সারা বাড়ী মাতিয়ে তুললো। তাদের কারো বুঝতে বাকী রইলো না যে, নিশ্চয়ই কোন অঘটন ঘটেছে। কারণ কুকুরটির স্বভাবই হলো, কোন দুর্ঘটনা হলেই সে ভীষণ চিৎকার শুরু করে দেয়। তাই জনাব আবু সালেহ খাবার রেখে

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, এক থুড়থুড়ে বুড়ো উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তিনি দ্রুত তাঁর সাহায্যের জন্যে এগিয়ে গেলেন। কাছে গিয়ে দেখলেন, বুড়ো বেহুশ হয়ে গেছে। শুকিয়ে গেছে তার ঠোঁট। জনাব সালেহ্ পানি এনে কিছু পানি খাওয়ালেন আর চেহারায় হালকা পানি ছিটিয়ে দিলেন।

সালেহ্ সাহেবের আন্তরিক সেবায় কিছুক্ষণ পর বুড়োর জ্ঞান ফিরে এলো। চোখ খুলেই তিনি দেখলেন, তাঁর শিয়রে বসে সেবা শুশ্রূষা করছেন এক শরীফ লোক। কৃতজ্ঞতায় ভরে গেলো তাঁর মন। তিনি দু'হাত উঠিয়ে আল্লাহ্র দরবারে প্রাণ খুলে দু'আ করলেন ঃ

"আল্লাহ্ তোমার হায়াত বৃদ্ধি করে দিন, তুমি দীর্ঘজীবী হও, সর্বদিক দিয়ে তোমার মঙ্গল হোক"। এরপর বুড়ো তাঁর বাড়ীতে চলে যায়।

বৃদ্ধের সেবা করতে পেরে জনাব সালেহ্ সাহেব নিজেকে গর্বিত মনে করলেন এবং সন্তানদের দিকে তাকিয়ে সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, দুনিয়াতে একটিই লাভজনক ব্যবসা আছে, তা হলো সৎ কাজ। এদিকে ইঙ্গিত করে ফার্সী ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি শেখ সাদী (রহঃ) কত সুন্দর করে গেয়েছেন ঃ

'খোদা প্রাপ্তি পথ রয়েছে লুকানো
মানব সেবার মাঝে,
পাবে নাকো তাকে (শুধু) আলখেল্লা
আর তাসবীহ্ ও জায়নামাযে।'

প্রকৃত বন্ধু

নির্জন জঙ্গলে মাঝ দিয়ে চলছে দুই বন্ধু। একজন মোটা তাজা, স্বাস্থ্যবান, আরেকজন ছিপছিপে-পাতলা। কিছু দূর এগিয়ে যাওয়ার পর স্বাস্থ্যবান বন্ধু অপর বন্ধুকে বললো, জনমানব শূণ্য এ জঙ্গল দিয়ে আমরা যাচ্ছি, যদি মানুষ খেকো কোন হিংস্রপ্রাণী আমাদের মেরে ফেলতে আসে; তখন আমাদের বাঁচার উপায় কী হবে?

জবাবে অপর বন্ধু তাকে সাহস দিয়ে বললো, আরে ভয়ের কোনই কারণ নেই, সে সময় আমরা একে অপরকে সাহায্য করবো। আর এ কথা খুব ভালো করে মনে রোখো। "মনের বাঘে খায়, বনের বাঘে খায় না।" উপস্থিত বুদ্ধি ও কৌশল হচ্ছে বিপদ থেকে মুক্তির উপায়।

দুই বন্ধু নানা ধরণের খোশ গল্প করছে আর অসীম সাহস নিয়ে সামনে হাঁটছে। হঠাৎ স্বাস্থ্যবান বন্ধু বলে উঠলো, দোস্ত! ঐ সামনের দিক তাকিয়ে দেখ। এতক্ষণ আমরা যে হিংস্রপ্রাণীর ভয় পাচ্ছিলাম, সে প্রাণীই এখন আমাদের দিকে তেড়ে আসছে। এখন আমাদের পালানোর পথ কোথায়?

সে বন্ধু সামনের দিক তাকিয়ে দেখলো, সত্যিই মানুষ খেকো এক বন্য ভল্লুক রক্ত লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাদের দিকেই আসছে। সঙ্গে

সঙ্গে সে দ্রুত এক গাছে উঠে পড়লো। ভুলে গেলো তার বন্ধুর কথা। তখন স্বাস্থ্যবান বন্ধুর মাথায় এক সুবুদ্ধির উদয় হলো। সে সময় নষ্ট না করে মাটিতে শুয়ে শ্বাস-নিশ্বাস বন্ধ করে দিয়ে মৃত্যুর ভান ধরলো।

ভল্লুকটি তার কাছে এসে নাকে, মুখে ও কানে জিহবা লাগালো, কিন্তু সে কোন নড়াচড়া করলো না। এতে ভল্লুকটি ভাবলো লোকটি মরা। তারপর উপরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে আফসোস করতে করতে বললো, গাছের উপর তো জীবিত মানুষ আছে, কিন্তু সেখানে উঠা তো অসম্ভব। সুতরাং সে চলে গেলো।

ভল্লুক চলে গেলে অপর বন্ধু তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে ঐ বন্ধুকে বললো, তুমি নিরাপদে থাকার জন্য আল্লাহর দরবারে শত কোটি শোকার আদায় করছি।

অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করলো, ভল্লুক তোমাকে কানে কানে কী বললো? সে বন্ধু উত্তরে বললো, ভল্লুক কানে কানে বলেছে, এমন লোককে কভু বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে তোমাকে অপমান করে এবং চরম বিপদের মুহূর্তে সাহায্যের পরিবর্তে দূরে সরে যায়।
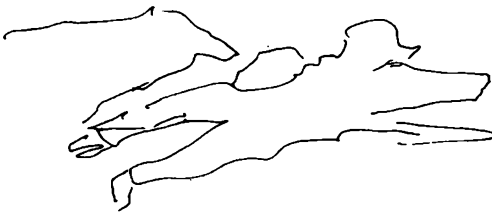
জোহার গল্প

জোহা একজন রসিক স্বভাবের লোক। মানুষকে আনন্দ দানের জন্যে তিনি বলেন, নানা রকম কৌতুক ও মজাদার হাসির গল্প। তাঁর প্রতিটি গল্পে থাকে সবার জন্যে হাসি ও আনন্দের খোরাক। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে মজার মজার অ-নে-ক গল্প।

একদিন তিনি তাঁর সাথী-সঙ্গীদের নিয়ে বসেছেন, শীতল ছায়াদার একটি গাছের নীচে। তাঁর সঙ্গীরা পরস্পরে আলোচনা করলো, আজ তাঁকে নিয়ে একটু রসিকতা করবে এবং তাঁরা সবাই সিদ্ধান্ত নিলো আজকে তাঁর জুতো জোড়া লুকিয়ে ফেলবে। দেখবে এরপর সে কী করে?

যেই ভাবা সেই কাজ। এবার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আরম্ভ হলো না ধরনের আলাপ ও খোশগল্প।

এক সঙ্গী বললো ঃ তোমরা খেয়াল করেছ, জোহার স্বাস্থ্য কী চমৎকার। তাঁর শরীরে শক্তিও প্রচুর। সে হাঁটে খুব দ্রুত। আবার নিপুণ দক্ষতার সাথে গাছ বেয়ে অতি তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে পারে।

জোহা বললো ঃ হ্যাঁ, আমি খুব দ্রুত হাঁটি এবং চমৎকার ভঙ্গিতে গাছে উঠতে পারি।

আরেক সঙ্গী বললো ঃ আমরা দেখতে চাই তুমি কীভাবে গাছ বেয়ে উপরে উঠো।

তাঁদের বলতে দেরি জোহার জুতো জোড়া খুলতে দেরি নাই। জুতো খুলে পকেটে রেখে অবলীলায় গাছ বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো।

আরেক সঙ্গী বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, আরে জোহা! তুমি এ কী করছো। জুতো পকেটে নিয়ে যাচ্ছ কেন? গাছের উপর তো তোমার জুতোর কোন প্রয়োজন নেই।

জোহা জবাবে বললো ঃ আমি আশা করছি গাছের উপর আরেকটি রাস্তা পাবো, সেখানে জুতো পায়ে হাঁটবো। তাঁর কথায় সঙ্গীরা সকলে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

অন্য একদিনের ঘটনা। এক মহিলা এলো তার কাছে। তিনি মহিলাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কী উদ্দেশ্য নিয়ে আমার কাছে এসেছেন? উত্তরে মহিলা বললো, বাগদাদে পাঠানোর জন্যে দুটি চিঠি লিখিয়ে নিতে এসেছি। একটি আমার ছেলে মোস্তফার কাছে অপরটি আমার চাচা কাজীর কাছে।

জোহা তখন বললো, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে মাফ করুন, বাগদাদে যাওয়ার মতো কোন সময় এখন আমার হাতে নেই। তাঁর কথা শুনে মহিলা আশ্চর্য হয়ে বললো, আরে আমি তো আপনাকে বাগদাদ যেতে বলছিনা। বরং আপনাকে বলছি শুধু দুটি চিঠি লিখে দেয়ার জন্যে।

জোহা তখন মুচকি হেসে বললো, আমি আপনাকে দুটি চিঠি লিখে দিলে, আপনার পুত্র ও চাচা উভয়ে আমার উপর ভীষন চটে যাবে। কারণ আমার হাতের লেখা এতো খারাপ যে, তাঁরা পড়তে পারবে না। সুতরাং চিঠি পড়ে দেয়ার জন্যে আমাকে ও চিঠির সঙ্গে বাগদাদ যেতে হবে।
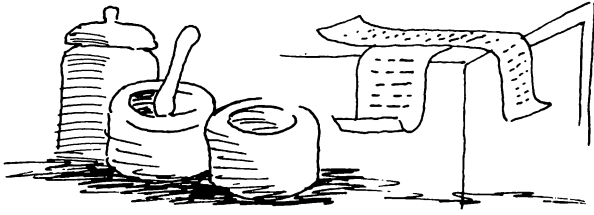
অভিজ্ঞ ডাক্তার

সে অনেক আগের কথা। এক দেশে ছিলো এক উযীর। দেশ জুড়ে ছিলো তাঁর নাম-যশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি। পাইক-পেয়াদা, গোলাম-বান্দী, দাস-দাসীর কোন অভাব ছিলো না, টাকা-পয়সাও ছিলো ঢের। এক কথায় সুখ-শান্তির জন্যে যা কিছু প্রয়োজন সবই ছিলো তার।

কিন্তু হলে কী হবে। প্রবাদ আছে 'সুস্থতাই সুখের মূল' সেটাই ছিলো না তাঁর। তাঁর স্বাস্থ্য ছিলো অস্বাভাবিক। মেদভূড়ি নিয়ে তিনি বেশ অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। ধীরে ধীরে অচল হয়ে পড়ে তাঁর স্বাভাবিক জীবন যাত্রা। সারা দিন বিছানায় শুয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোন কাজ তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

একদিন তিনি সকল ডাক্তারদের ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই তাঁর চিকিৎসা করতে ব্যর্থ হয়।

অতঃপর উযীরকে একজন প্রবীন ও অভিজ্ঞ ডাক্তারের সন্ধান দেয়া হলো। তাঁকেও তিনি ডেকে পাঠালেন। ঐ প্রবীন ডাক্তার সাহেব এলে উযীর মহোদয় বললেন, গোশ্‌ত ও চর্বি আমাকে সকল কাজ হতে অপারগ করে রেখেছে। আপনি ভালোভাবে এর চিকিৎসা করুন, যাতে এ আযাব থেকে মুক্তি পাই।

ডাক্তার সাহেব তখন উযীরকে বললেন, আল্লাহ্ পাক আপনার সার্বিক মঙ্গল করুন এবং সুস্থতা দান করুন। আমি একজন ডাক্তার ঠিক। এর সাথে সাথে আমি একজন জ্যোতিষও বটে। আমি আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করে সে অনুযায়ী চিকিৎসা করবো।

তাই আপনার চিকিৎসার জন্যে আমাকে আজ রাতটুকুর সময় দিতে হবে। আজ রাতে আমি দেখবো, আপনার ভাগ্যে কি উদিত হয়? তারপর আপনার রোগের চিকিৎসা বাতলে দেবো। উযীর সাহেব বললেন, শুধু আজ রাত কেন, আপনি যতদিন সময় চান, দেয়া হলো। সেদিন বিদায় নিয়ে ডাক্তার সাহেব চলে গেলেন।

পরের দিন ডাক্তার সাহেব এসে উযীর মহোদয়কে বললেন, জনাব! আগে আমার জানের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিন। পরে আপনার চিকিৎসার কথা বলবো।

উযীর সাহেব বললেন, হ্যাঁ, আপনার জীবনের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হলো।

এবার ডাক্তার সাহেব বললেন, বিগত রাতে আপনার ভাগ্যের যে তারকা উদিত হয়েছিলো, তাতে আমি দেখেছি আপনার জীবনের আর মাত্র ত্রিশ দিন বাকী আছে। এখন আপনি চাইলে, তবেই আমি আপনার চিকিৎসা করতে পারি এবং ঔষধ লিখে দিতে পারি। আমার মুখের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে আমাকে বন্দী করে রাখুন। যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তবে আমাকে মুক্তি দিয়ে দিবেন। আর যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে আমাকে কতল করে দিবেন।

ডাক্তারের নিজের কথা অনুযায়ী উযীর তাঁকে বন্দী করে রাখলেন। এরপর তাঁর সভাসদদের বললেন, আমার জন্যে একটি নিরিবিলি কামরা নির্বাচন কর এবং সেখানে আনন্দ বিনোদনের কিছু সামগ্রী- উপস্থিত কর।

উযীরের নির্দেশ অনুসারে সব কিছুর ব্যবস্থা করা হলো। এবার তিনি সবার থেকে আলাদা হয়ে সে নীরব নির্জন কামরায় একাকী থাকতে লাগলেন।

দিন যতই অতিবাহিত হচ্ছিলো, উযীরের চিন্তা ও ভয় ততোই বেড়ে যাচ্ছিলো। সীমাহীন চিন্তা ও ভয়ের কারণে স্বাস্থ্য ও চর্বি কমে গেলো। এমনিতে চলে গেলো আটাশ দিন। উনত্রিশ দিনের মাথায় উযীর আবার ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন।

ডাক্তার উযীরের সামনে হাজির হয়ে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সম্মানিত করুন। অদৃশ্যের খবর একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন।

অতএব যেখানে আমি আমার নিজের জীবনের শেষ সীমানা সম্পর্কে অজ্ঞ, সেখানে আমি আপনার জীবনের আর কতদিন আছে তা কী করে জানবো? কিন্তু জনাব, আপনার অন্তরে চিন্তা ও ভয় ঢুকিয়ে দেয়া ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসা আমার জানা ছিলো না। কারণ এ দুটি জিনিষই মানুষের স্বাস্থ্য ও চর্বি কমিয়ে দেয়।

ডাক্তারের দূরদর্শীতা দেখে উযীর একই সঙ্গে আশ্চর্য ও আনন্দিত হলেন। সাথে সাথে তাঁকে সম্মানের সঙ্গে মূল্যবান পুরস্কারে ভূষিত করলেন।
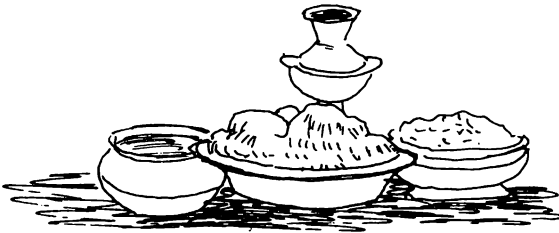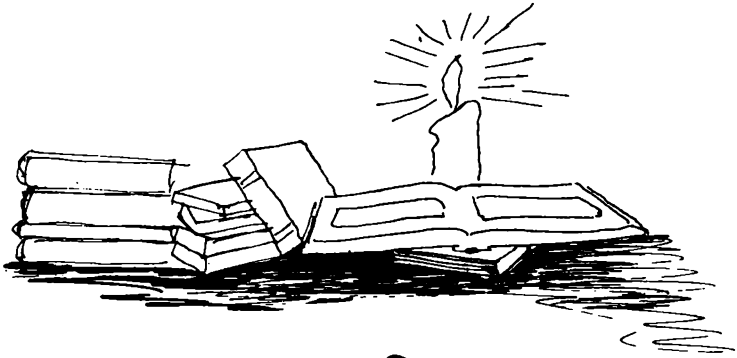
জ্ঞানের পিপাসা

শিক্ষা ও জ্ঞান ছাড়া কেউ কোন দিন প্রকৃত মানুষ হতে পারে না। জীবনে উন্নতি করতে পারে না। ফলে সফলতা আসে না তার জীবনে। যে দেশের মানুষ যত বেশি শিক্ষিত হয়, সে দেশের উন্নতি ততো বেশি হয়। সমাজের লোকেরা হয় সভ্য-শিষ্ট। তাইতো আমাদের প্রিয় নবীজী (সাঃ) কে আল্লাহ পাক প্রথমেই পড়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন- "পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন।"

আর এ শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের মূল চাবি কাঠি হলো খুব বেশি বেশি করে সুন্দর ও ভালো বই পড়া। কেননা মানুষের জীবন সীমিত আর জ্ঞান হচ্ছে অসীম। তাইতো ইতিহাস পড়লে জানা যায়, আমাদের মনীষীগণ খুব বেশি বেশি করে পড়াশোনা করতেন। যখন কোন ছাপাখানা ছিলো না, বরং নিজ হাতে লিখে পড়তে হতো। এখন তো আমাদের কোনই কষ্ট করতে হয় না। বই আকারে ছেপে বাজারে আসে, সেখান থেকে আমরা টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে আসি।

মনীষীদের জীবনী পড়লে তাঁদের জ্ঞান পিপাসার অনেক আশ্চর্য ঘটনার কথা জানা যায়। এমনি একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা আজ বলছি। জগত বিখ্যাত মনীষী আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার নাম আমরা

অনেকেই জানি। এই মহা মনীষী অসুস্থ হলেও বই মাথার কাছেই রেখে দিতেন। যখনই একটু ভালো লাগতো, তখনই পড়া শুরু করতেন। আবার যখন খারাপ লাগতো, রেখে দিতেন।

একবার তিনি অসুস্থ হলে ডাক্তার এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ঔষধ দিয়ে গেলেন, আর বললেন, আপনার জন্যে কোন কিছু পড়া নিষেধ। কিন্তু ডাক্তার দ্বিতীয়বার যখন এলেন, তখন দেখলেন, তিনি বই পড়ছেন। পড়া দেখে ডাক্তার বললেন, জনাব! এখন বই পড়া আপনার জন্যে একেবারে অনুচিত। এভাবে আপনি নিজেকে দুর্বল করে দিচ্ছেন, এবং দ্রুত সুস্থ হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করছেন।

জবাবে তিনি বললেন, অন্তর যখন আনন্দবোধ করে, শক্তিশালী হয়, তখন কী রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে না? ডাক্তার সাহেব বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই করে। তখন আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বললেন, আমার মন জ্ঞান অর্জনের দ্বারা আনন্দিত হয় এবং আমি আরামবোধ করি ও শক্তি পাই, যা আমাকে রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

ইবনে তাইমিয়ার এমন যক্তিপূর্ণ সুন্দর উত্তর শুনে ডাক্তার সাহেব অবাক হলেন এবং বললেন, আপনার কথাই ঠিক।
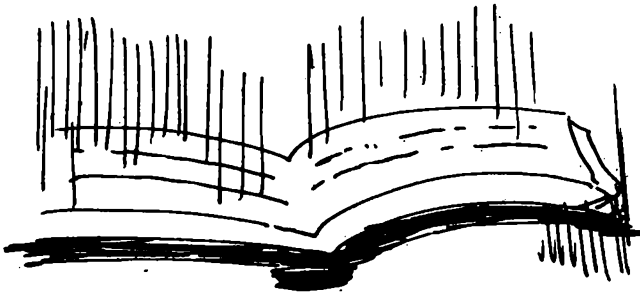
কৃতজ্ঞ কুকুর

কুকুর একটি অতি বিনয়ী, মনীবভক্ত, কৃতজ্ঞ ও বিশ্বস্ত প্রাণী। যার তুলনা হয় না। শত মারধর ও অনাহারের কষ্ট ভোগ করে, তবুও সহজে তার মালিককে ছেড়ে যায় না। তাঁর ঘরের দুয়ারেই পড়ে থাকে সর্বদা।

এমনই একটি কুকুর ছিলো এক লোকের। একদিন মনীব এক বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে যান। আর তাঁর ছোট্ট সন্তানকে পাহারা দেয়ার জন্যে রেখে যান তাঁর কুকুরটিকে।

কাজ শেষে যখন তিনি বাড়ী ফিরলেন, তখন বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সারা দিনে আকাশের লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে সূর্যের লালিমা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। পাখিরা সব ফিরে যাচ্ছে আপন আপন নীড়ে। তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করতেই কুকুরটি দৌড়ে এসে লেজ নেড়ে নেড়ে খুব আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো, হঠাৎ মনীবের চোখ পড়লো কুকুরের মুখের উপর। মুখে ওর রক্ত লেগে আছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন এ আমার সন্তানকে খেয়ে ফেলেছে। এই ভেবে রাগে তিনি আগুন হয়ে গেলেন। মাথায় তাঁর খুন চড়ে গেলো। নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। প্রচন্ড ক্রোধের কারণে

অন্য কিছু ভাবারও সময় হলো না। একটি কুড়াল নিয়ে এক আঘাতে কুকুরটিকে মেরে ফেললেন।

এরপর অশ্রুসিক্ত চোখে ভরাক্রান্ত হৃদয়ে ছেলের বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন। ছেলেকে দেখে তো তিনি একেবারে অবাক। ছেলে পুরো সুস্থ। তাঁর দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসছে, আর হাত পা ছুঁড়ে খেলছে। ওর বিছানার পাশে টুকরো টুকরো অবস্থায় পড়ে আছে একটি বিষাক্ত সাপ। বুঝতে পারলেন, কুকুর তাঁর ছেলেকে এই সাপের হাত থেকে রক্ষা করেছে। তার মুখে সাপের রক্তই লেগেছিলো।

তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে এমন বিশ্বস্ত কুকুরটিকে হত্যা করার কারণে নিজে নিজের কাছে খুব লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। তারপর আবার কুকুরের কাছে ফিরে গেলেন। ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে নির্বাক পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন তার মৃত কুকুরটির পাশে। তাইতো জ্ঞানীগণ বলে থাকেন ঃ

"ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।"
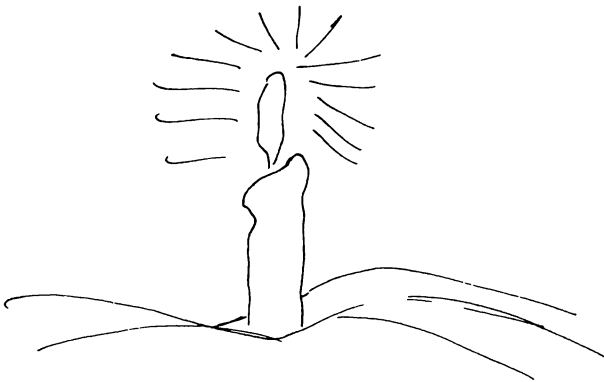
শিক্ষার মর্যাদা

সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ সৈনিক ইতিহাসখ্যাত হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের নাম আমরা সবাই জানি। কিন্তু আরেকজন উমর আছেন, যাঁর আদল, ইনসাফ ও মহানুভবতার কথাও ইতিহাসের ক্ষয়হীন পৃষ্ঠায় সোনালী হরফে লিখা থাকবে চিরদিন। অথচ আমরা অনেকেই তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না। হ্যাঁ, তাঁর নামই এখন আমি বলছি। তিনি হলেন হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ)।

প্রিয় নবীজী (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদার পরে পুনরায় মুসলিম জাহানে ইসলামী খেলাফত ও সোনালী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন এই মহান খলীফা। গড়েছিলেন সুখ-শান্তির স্বর্গরাজ্য। তাঁর শাসনকালে একই ঘাটে পানি পান করেছে হিংস্র বাঘ আর নিরীহ বকরী।

তিনি যখন খলীফা নির্বাচিত হলেন, তখন তাঁকে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্বর্ধনা জানানোর জন্যে সারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিভিন্ন প্রতিনিধি দল আসতে থাকে। যেমন আজকের যুগেও কেউ প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলে, কিংবা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা লাভ করলে, তাকে ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়।

যে সকল প্রতিনিধি দল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছিলো, সেগুলোর একটি ছিলো হিজাযের। তাঁদের কাফেলায় ছিলো এক কিশোর, বয়স ও আকারে ছোট হলেও জ্ঞান ছিলো তার অগাধ।

মুসলিম জাহানের খলীফার জাঁকজমকপূর্ণ দরবার। জমকালো কুরসীতে বসে আছেন তিনি। এখন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে। কে কথা বলবে? কিশোরই এগিয়ে এলো কথা বলার জন্যে। তখন খলীফা বললেন, হে কিশোর! তুমি থাম। বয়সে যিনি তোমার চেয়ে বড়, তিনিই আমার সঙ্গে কথা বলবেন।

মহামান্য খলীফার কথার জবাবে কিশোর নির্ভয়ে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! মানুষের মূল্যায়ণ বয়সে হয় না। বরং মানুষের মূল্যায়ণ হয়, জ্ঞান-বুদ্ধি ও শিক্ষার দ্বারা। মানুষের মূল্যায়ণের মাপকাঠি যদি বয়সই হতো তাহলে এ কাফেলায় আপনার তুলনায় বয়সে বড় লোক অনেকেই রয়েছেন, তাঁদেরই একজন খেলাফতের সিংহাসনে সমাসীন হতেন।

কিশোরের জ্ঞানগর্ভ উত্তর শুনে খলীফা যেমনি আশ্চর্য হলেন, তেমনি মুগ্ধ হলেন। তাঁর অজান্তেই তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো কবিতার চারটি লাইন ঃ

"জ্ঞান অর্জন কর তুমি জীবন ভর,
জ্ঞানী হয়ে কেহ জন্মে না পৃথিবী পর।
শুনে রাখ তুমি, দিয়ে তনুমন,
জ্ঞানী ও মূর্খ কভু হয় না সমান।"

অতঃপর কিশোর বললো, আমরা আপনার শাহী দরবারে কোন কিছু পাওয়ার আশায় আসিনি। কারণ আপনার কাছ থেকে যে শান্তি ও নিরাপত্তার আশা করেছিলাম, তা পরিপূর্ণভাবে পেয়েছি। এখন আমরা এসেছি কেবলমাত্র আপনাকে অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে।

মুখোশ পরা লড়াকু

হিজরী তেরশ সনের কথা। হঠাৎ বেজে উঠে যুদ্ধের দামামা। শুরু হয় মুসলমান এবং বাইযেন্টাইনদের মাঝে প্রচণ্ড এক লড়াই। লড়াই যখন ভয়াবহ আকার ধারণ করলো, তখন মুসলিম মুজাহিদগণ অবাক বিস্ময়ে দেখলো মুখোশ পরিহিত এক লড়াকু যোদ্ধার বীরত্ব। তাঁর আপাদমস্তক ছিলো কালো কাপড়ে ঢাকা। চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। সে বিদ্যুৎ বেগে রোমান সৈন্যদের কাটতে কাটতে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। দেখতে দেখতে চোখের পলকে সে শত্রুদের সারি ভেদ করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। সে যেদিকে যাচ্ছিলো, সেদিকে লাশের স্তূপ হয়ে যাচ্ছিলো। তাঁর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিলো, সে শাহাদাতের অমীয় সুধা পানের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

সে যুদ্ধের সিপাহ্সালার ছিলেন, আল্লাহর তরবারী হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রাযিঃ)। তাই প্রথম পর্যায়ে মুসলিম মুজাহিদগণ ভাবলেন, ইনি খালিদ সাইফুল্লাহ, কিন্তু যুদ্ধের মাঝে একবার তাঁরা হযরত খালিদকে দেখতে পেয়ে তাঁদের বিস্ময়ের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। তাঁদের সবার মনে একই প্রশ্ন, তাহলে কে এই বীর পুরুষ?!

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি হেনে সবাই তাকিয়ে থাকে অপরাজেয় বীর মুজাহিদ খালিদের দিকে। মুজাহিদদের এভাবে তাকানোর রহস্য বুঝতে পেরে

তিনি বললেন, এই ঘোড়সোয়ারের বীরত্ব দেখে আমি তোমাদের চাইতে অধিক বিস্মিত হয়েছি।

এরপর সিপাহসালার হযরত খালিদ বিন ওলীদ মুজাহিদদের ভিতর ঘোষনা দিয়ে দিলেন, হে আল্লাহর সৈনিকেরা! তোমরাও এই অজেয় যোদ্ধার সাথে মিলে আক্রমণ চালাও। নির্দেশ মাত্রই ঝড়ের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো মুজাহিদ দল। সাথে সাথে নেমে এল আল্লাহর গায়েবী মদদ। খোদার সৈনিকদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে আল্লাহর দুশমনরা টিকতে পারলো না। মুহূর্তের মধ্যে মুজাহিদগণ ঢুকে পড়ে শত্রু শিবিরে। তাড়া খাওয়া ইঁদুরের মতো রোমান সৈন্যরা ভয়ে যে যেদিকে পারে ছুটে পালিয়ে জীবন বাঁচায়। খালি হয়ে যায় যুদ্ধের ময়দান। বিজয়ের গৌরব পদ চুম্বন করে মুসলিম মুজাহিদদের।

লড়াই শেষ। এবার সবাই ঘিরে দাঁড়ালো মুখোশ পরা মুজাহিদকে। জানতে চাইলো তাঁর পরিচয়। সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, হে সিংহ শাবক! বীর শার্দুল! কে তুমি? কিন্তু একী। সে কোন জবাব না দিয়ে ঘুরিয়ে দিলো অশ্বের বাগ। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো আপন গন্তব্য পানে। তাঁর আচরণে মুসলিম মুজাহিদরা বিস্মিত হলো। অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলো তাঁর ছুটে চলার দিকে।

কিন্তু সিপাহসালার খালিদ বসে রইলেন না। তিনিও অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন তাঁর পিছু পিছু। সাথে সাথে জোরে চিৎকার দিয়ে বললেন, হে দুর্নিবার মুজাহিদ! তোমার পরিচয় আমাদের কাছে গোপন রেখো না। আজ তোমার বীরত্ব আমার ও আমার সাথীদের হৃদয় মন কেড়ে নিয়েছে। ত্বরান্বিত করেছে আমাদের বিজয়।

হযরত খালিদের চিৎকারে থমকে দাঁড়ালেন ঘোড়সোয়ার। শক্ত হাতে টেনে ধরলেন ছুটন্ত ঘোড়ার লাগাম। তারপর মিনতি ভরে বললেন, হে সম্মানিত দলপতি! লজ্জা হেতুই আমি আপনাকে এড়িয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তা আর হলো না। তাহলে শুনুন আমার পরিচয়।

আমি খাওলা বিনতে আযরু। মুশরিকদের কয়েদ খানায় বন্দী যিয়াদের বোন।

হযরত খালিদ তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, হে আযরুর কন্যা! আল্লাহ্ তোমার দীর্ঘ হায়াত দান করুন। খোদার শপথ! তোমার ন্যায় বীরঙ্গনা যে ময়দানে থাকবে, তাঁরা কোন দিন পরাজয়ের মুখ দেখবে না।

সমাপ্ত
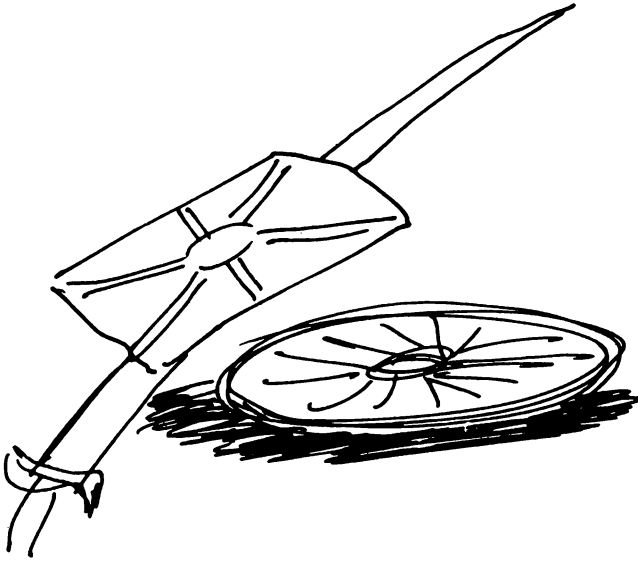
মাকতাবাতুল আশরাফ

কর্তৃক প্রকাশিত শিশু-কিশোর উপযোগী আরো কয়েকটি বই

....

নীল দরিয়ার নামে
(গল্প সংকলন)
মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা মাত্র

....

শহীদানের গল্প শোন
(সিরিজ ১-১০)
মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা (প্রতি খণ্ড)

....

কিশোর সাহাবী
(সিরিজ ১-১০)
মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা (প্রতি খণ্ড)

....

আলোর মিছিল (১ম-৫ম খণ্ড)
(তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন)
মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা (প্রতি খণ্ড)

....

কিসরার মুকুট
(সাহাবায়ে কেরামের গল্প)
মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা মাত্র

....

অজানা দ্বীপের কাহিনী
(হাদীস শরীফে বর্ণিত বিস্ময়কর ঘটনাবলী)
মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র

আমাদের প্রকাশিত
শিশু-কিশোর উপযোগী কয়েকটি বই

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ইসলামী টাওয়ার, (দোকান নং-৫)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০